

কলাম

মতামত

১০৬ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: এবার প্রয়োজন পুনর্জাগরণ

লেখা: এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ

প্রকাশ: ০১ জুলাই ২০২৬, ১৪: ৩৪



১৯২১ সালের ১ জুলাই যাত্রা শুরু করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়; প্রতিটি প্রজন্মই একে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে। কারও কাছে এটি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, কারও কাছে গণতন্ত্রের দুর্গ, আবার কারও কাছে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র গঠনের প্রেরণার উৎস। আজ ১০৫ বছর পরে, নতুন প্রজন্মের সামনে প্রশ্নটি ভিন্ন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি আবার নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে পারবে?

১ জুলাই ২০২৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে। এবারের প্রতিপাদ্য —‘উচ্চশিক্ষায় গণতন্ত্র ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনরুদ্ধার’ সমন্বয়যোগী। তবে আমার মতে, আজ কেবল পুনরুদ্ধার নয়; প্রয়োজন পুনর্জাগরণ। কারণ, অতীতের গৌরব ফিরিয়ে আনাই যথেষ্ট নয়, ভবিষ্যতের জন্য একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের রাষ্ট্র গঠন ও রাজনৈতিক রূপান্তরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, আশির দশকের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং সর্বশেষ ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান—প্রতিটি জাতীয় সন্ধিক্ষণে এই বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের প্রতিটি মোড়ে পথ দেখানো এ প্রতিষ্ঠানের সামনে আজ আরেকটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব এসে দাঁড়িয়েছে—নিজের প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্জাগরণ।

এটি আশাব্যঞ্জক যে বর্তমান সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ঘাটতির বিষয়টি প্রকাশ্যে তুলে ধরেছে এবং এটিকে সংস্কারের অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এখন প্রয়োজন এই উপলব্ধিকে বাস্তব নীতিতে রূপ দেওয়া।

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে জনপরিসরের আলোচনা খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেউ একে ‘কোচিং সেন্টার’, কেউ ‘ডুবন্ত জাহাজ’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এসব মন্তব্য হয়তো অতিরঞ্জিত, কিন্তু এগুলো একটি বাস্তব উদ্বেগের প্রতিফলন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীতের গৌরব নিয়ে আমাদের গর্ব আছে, কিন্তু সেই গৌরব ভবিষ্যতের সাফল্যের নিশ্চয়তা নয়।

বিশ্বজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষ এখন মূলত গবেষণা, আন্তর্জাতিকীকরণ, উদ্ভাবন এবং জ্ঞান সৃষ্টির সক্ষমতা দিয়ে পরিমাপ করা হয়। এই বাস্তবতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে অংশ নিচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু অগ্রগতি হয়েছে; কিউএস র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি আবার বিশ্বের শীর্ষ ৬০০-এর ঘরে ফিরেছে। এটি ইতিবাচক হলেও আমাদের আত্মতুষ্টি হওয়ার সুযোগ নেই। দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গত দুই দশকে যে গতিতে এগিয়েছে, তার তুলনায় আমাদের অগ্রগতি এখনো সীমিত।

অথচ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেখায়, প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা কোনো স্থায়ী নিয়তি নয়। মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব মালয়া একসময় বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেক বাইরে ছিল। পরিকল্পিত সংস্কার, গবেষণায় বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক মেধা আকর্ষণের মাধ্যমে এটি আজ বিশ্বের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। একইভাবে চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটি ও সিনহুয়া ইউনিভার্সিটি শতবর্ষী প্রতিষ্ঠান হয়েও নিজেদের নতুনভাবে গড়ে তুলেছে রাষ্ট্রীয় কৌশল, গবেষণা বিনিয়োগ এবং বৈশ্বিক মেধা আকর্ষণের মাধ্যমে।

এই অভিজ্ঞতাগুলোর একটি অভিন্ন শিক্ষা রয়েছে—বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে বিশ্বমানের মেধাকে আকর্ষণ ও ধরে রাখার সক্ষমতার ওপর। মালয়েশিয়ার ‘রেসিডেন্ট পাস-ট্যালেন্ট’ কর্মসূচি কিংবা চীনের ‘হান্ড্রেড ট্যালেন্টস’ উদ্যোগ দেখিয়েছে, প্রবাসী শিক্ষাবিদদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য শুধু দেশপ্রেম যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, গবেষণা পরিবেশ এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত অঙ্গীকার।

এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও প্রাসঙ্গিক। দীর্ঘ আন্তর্জাতিক একাডেমিক জীবন শেষে আমি দেশে ফিরে এসেছি কোনো রাজনৈতিক আকাজক্ষা থেকে নয়, বরং বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার নবায়নের প্রকল্পে অংশ নেওয়ার প্রত্যাশায়। কিন্তু দেশে ফিরে উপলব্ধি করেছি, বাংলাদেশে, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবাসী গবেষকদের ফিরিয়ে আনার জন্য কার্যকর কোনো ‘ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশন’ কাঠামোই নেই। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মালয়েশিয়া ও চীন সফর এই পূর্ব এশীয় অভিজ্ঞতা থেকে শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে।

তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি বিদেশে নয়, ঘরেই রয়েছে। প্রতিবছর দেশের সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এই মানবসম্পদই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা এই সম্ভাবনাকে গবেষণায় রূপান্তর করতে পারিনি। পূর্ব এশিয়ার সফল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের সেরা শিক্ষার্থীদের নিয়েই শক্তিশালী পিএইচডি কর্মসূচি, গবেষণাগার এবং উদ্ভাবনী পরিবেশ গড়ে তুলেছে। বিপরীতে আমাদের সেরা স্নাতকদের বড় অংশ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যায় এবং দেশে ফিরে গবেষণার উপযোগী পরিবেশ না পেয়ে সেখানেই থেকে যায়। ফলে আমাদের মেধা ক্রমাগত একমুখীভাবে দেশ ছাড়ছে। আমার দেশে ফেরা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্তটি মূলত আমাদের শিক্ষার্থী এবং তরুণ প্রতিভাবান ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের ওপর রাখা একটি বাজি।

তবে বিচ্ছিন্ন বা সময়হীন ব্যক্তিগত উদ্যোগ কখনো যথেষ্ট হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্জাগরণ কোনো একক উপাচার্য, শিক্ষক বা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি হবে একটি নতুন সামাজিক চুক্তির ফল, যেখানে রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনকে সম্মান করবে, বিশ্ববিদ্যালয় উৎকর্ষ ও জবাবদিহির মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করবে, আর শিক্ষার্থীরা দলীয় রাজনীতির হাতিয়ার নয়, জ্ঞান ও উদ্ভাবনের অগ্রদূত হয়ে উঠবে।

এটি আশাব্যঞ্জক যে বর্তমান সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ঘাটতির বিষয়টি প্রকাশ্যে তুলে ধরেছে এবং এটিকে সংস্কারের অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এখন প্রয়োজন এই উপলব্ধিকে বাস্তব নীতিতে রূপ দেওয়া। গবেষণাভিত্তিক অর্থনীতি গড়তে হলে গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার কোনো বিকল্প নেই। চীন ও মালয়েশিয়ার মতো উদীয়মান উচ্চশিক্ষার তারকা দেশগুলোর সফল মডেল থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি পূর্ব এশীয় ধাঁচের, ‘মেধা প্রথম’ নবায়ন মডেল প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করা যেতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক এমন পথ তৈরি করার মাধ্যমে যেখানে প্রবাসী শিক্ষাবিদ এবং বিদেশি গবেষকদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা, গবেষণা করা এবং পড়ানোর প্রক্রিয়াকে সক্রিয়ভাবে স্বাগত জানানো হবে।

- এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ও আইডিইএএসের সিনিয়র ফেলো

